ড. আলী তানতাবী
হে আমার
মুসলিম
ভাই

ড. আলী তানতাবীর পরিচিতি

বিংশ শতাব্দিতে যে সকল আরব মনীষী তাদের কলম আর যবানের মাধ্যমে দাওয়াতের ময়দানে বিশাল বড় অবদান রেখেছেন তাদের অন্যতম হলেন শায়েখ আলী বিন মুস্তফা আত-তানতাবী।

সংক্ষেপে তিনি আলী তানতাবী নামেই সমধিক পরিচিত। ১৯০৯ সালে সিরিয়ার দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শায়েখ মুস্তফা তানতাবি ছিলেন সিরিয়ার একজন নামকরা আলেম। দামেস্কের ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব তার কাঁধে অর্পিত ছিল। তার মায়ের বংশও ছিল অত্যন্ত খ্যাতিমান ও অভিজাত।

ষোল বছর বয়সেই তাঁর পিতা মারা যান। পরিবারে তখন তাঁর মা এবং তারা পাঁচ ভাইবোন। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়ার মানসে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলার দয়ায় তিনি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এবং পুনরায় পড়াশোনায় মন দেন।

১৯৩১ সালে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু। সেসময় তিনি 'আল আইয়াম' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সত্য কথনের দায়ে তৎকালীন সরকার সেটি বন্ধ করে দেয়। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি সিরিয়াতেই শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত থাকেন। সত্যবাদিতা আর সৎসাহসের জন্য এই সময় তাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তার উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়।

১৯৩৬ সালে তিনি ইরাক গমন করেন। সেখানে বাগদাদের একটি কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। এখানকার স্মৃতি নিয়েই পরবর্তীতে তিনি তার বিখ্যাত 'বাগদাদ: মুশাহাদাত ওয়া যিকরিয়াত' গ্রন্থটি রচনা করেন। কয়েক বছর পর তিনি আবার মাতৃভূমি সিরিয়ায় ফিরে যান এবং দামেস্কে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেসময় সিরিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। দুঃসাহসিকতার জন্য তাকে তখন অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। জার্মানির হাতে যখন ফ্রান্সের পতন হয় তখন তিনি জ্বালাময়ী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সিরিয়ার জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা ফ্রান্সকে ভয় করো না। তাদের অন্তরগুলো সারশূন্য। তাদের বীরত্বপনা

= পরের ফ্ল্যাপে দেখুন

কেবলই ফাঁকাবুলি। তাদের প্রজ্বলিত অগ্নি জ্বালাতে পারে না। তাদের ছোড়া বুলেট আঘাত হানতে পারে না। যদি তাদের মাঝে কল্যাণকর কিছু থাকতো তবে জার্মান কখনও তাদের রাজধানী পদানত করতে পারতো না।' তার এই অগ্নিকণ্ঠের ভাষণ সেসময় সিরিয়ার লোকদের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বেশ উজ্জীবিত করেছিল। মূলত সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন আপোষহীন। ন্যায়ের পক্ষে সব সময় বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী।

এই ঘটনার পর তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে বিচারকার্যের সাথে সম্পৃক্ত হন। এবং দীর্ঘ সময় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৯৬৩ সালে সৌদিআরব গমন করেন। সেখানে একটি কলেজে শিক্ষকতার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। যা বর্তমানে ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। এছাড়াও সৌদি অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউটে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন।

ড. আলী তানতাবীকে আল্লাহ তাআলা অসাধারণ লেখনী শক্তি দান করেছিলেন। যতোদিন বেঁচে ছিলেন দু'হাতে লিখে গিয়েছেন। তার প্রায় সব লেখাই প্রথমে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে সেগুলোকে সংকলিত করে গ্রন্থের আকার দেওয়া হয়। তার বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ হল, আবু বকর সিদ্দিকিন (১৯৩৫), আখবারু উমর (১৯৫৯), আ'লামুত তারিখ (১৯৬০), বাগদাদঃ মুশাহাদাত ওয়া যিকরিয়াত (১৯৬০), তারিফ আম বিদ্বিনীল ইসলাম (১৯৭০), আলজামেউল উমাবি ফি দিমাশক (১৯৬০), হেকায়াত মিনাত তারিখ (১৯৬০), রিজাল মিনাত তারিখ (১৯৫৮), সুওয়ার ওয়া খাওয়াতির (১৯৫৮); ফি সাবিলিল ইসলাহ (১৯৫৯), কাসাস মিনাত তারিখ (১৯৫৭), কাসাস মিনাল হায়াত (১৯৫৯), মাআন নাস (১৯৬০) মাকালাত ফি কালিমাত (১৯৫৯), মিন হাদিসিন নাফস (১৯৬০), হুতাফুল মাজদি (১৯৬০)

শেষ বয়সে আলী তানতাবী শারীরিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েন। হাসপাতাল আর বাসায় অনেক বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে হয় তাকে। মৃত্যুর বছর যা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৯৯ সাল ১৪ রোজ শুক্রবার এই মহা মনীষী জেদ্দার বাদশা ফাহাদ হাসপাতালে পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করে পরকালের অনন্ত পথে পাড়ি জমান। পরের দিন মসজিদুল হারামে জানাযা শেষে মক্কাতুল মুকাররমার কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

মুহাম্মাদ দিলাওয়ার হোসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

হে আমার মুসলিম ভাই

ড. আলী তানতাবী

মাওলানা মাহমুদ আহমাদ অনূদিত

হে আমার মুসলিম ভাই

ড. আলী তানতাবী

ভাষান্তর
মাহমুদ আহমাদ

প্রকাশনা
৪৬ [ছিচল্লিশ]

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১৮

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ৬০ টাকা মাত্র

Sajdah
O Allah
YOU DO NOT NEED AN APPOINTMENT
TO TALK TO ALLAH.
HE IS AVAILABLE TO LISTEN TO YOU 24/7.
সূচি

হে আমার মুসলিম ভাই

ধর্ম হিসেবে ইসলাম তিনটি বিষয়ের সমষ্টি : ১. ধর্মের বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, ২. সেগুলোকে অন্তরের গভীর থেকে বিশ্বাসকরণ এবং ৩. সেগুলো কর্মে বাস্তবায়ন।

একজন মানুষ প্রকৃত মুসলিম তখনই হতে পারবে, যখন সে জানবে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সা.-কে দুনিয়ায় নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন এমন এক সময়, যখন নবীদের দাওয়াত না থাকার কারণে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল জাহিলিয়্যাতের ঘোর অন্ধকার। তিনি নবী সা.-কে দিয়েছেন সর্বজনীন ও সর্বকালীন শরীয়ত ও জীবনব্যবস্থা। যে শরীয়ত তার অনুসারীদেরকে দান করেছে দুনিয়া-আখেরাতের সুখময় জীবন। যে জীবনব্যবস্থাকে আল্লাহ তাআলা প্রণয়ন করেছেন বিশ্ববাসীর সুখ, শান্তি ও কল্যাণের জন্য। যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে দেখিয়েছেন সরল ও সুন্দর পথ।

আল্লাহ তাআলা নবী সা.-এর কাছে পাঠিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার সবকিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বাঞ্ছিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কিছুই স্থান পায়নি সেখানে। আল-কুরআন হলো 'কালামুল্লাহিল কাদিম' [আল্লাহর অবিনশ্বর গ্রন্থ]।

নবী মুহাম্মাদ সা.-এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয় নবুয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা। তাই মুহাম্মাদ সা.-এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। সে আরও জানবে ও বিশ্বাস করবে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতুননবী হলো ইসলামের মূল স্তম্ভ ও হেদায়েতের বাতিঘর। সুতরাং কুরআনে যা-কিছু বিবৃত হয়েছে, সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে সেসব কিছুই ইসলামের মূল উৎস। এর বাইরে যা-কিছু আছে, যেমন বেদআতগুলোকে একদল লোক দ্বীনের অংশ বানিয়ে নিয়েছে কিংবা দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো বিষয়ের সংযোজন করেছে, যা কুরআনে নেই, হাদীসেও বর্ণিত হয়নি এবং যার উপর উলামায়ে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করেও তা বলা হয়নি। সেগুলো আদৌ দ্বীনের অংশ নয়।

প্রকৃত মুসলিম আরও জানবে এবং বিশ্বাস করবে, ইসলামের সাথে দুনিয়ার অন্যকোনো ধর্মের মুশাবাহাত বা সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য নেই। অন্যসব ধর্মকে ইসলামের সাথে তুলনা করবে না। কেননা, ইসলাম হলো একাধারে ধর্ম, জীবনব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও উত্তম চরিত্রবিধান। ইসলাম আব্‌দের সাথে মাবুদের সম্পর্ক জুড়ে দেয়। মানুষকে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখার সবক শেখায়। ইসলাম রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার শিক্ষা দেয়। মানুষ যখন শক্ত পায়ে জমীনের উপর দাঁড়ায়, যখন সে সফল হয়, ইসলাম তখনও তার সঙ্গে থাকে; মানুষ যখন হোঁচট খায়, যখন সে ব্যর্থ হয়, তখনও ইসলাম তার সঙ্গে থাকে। সামান্য সময়ের জন্যও ইসলামের বিধানাবলি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। দুনিয়ার এমন কোনো কাজ নেই, যা ইসলামের সুস্পষ্ট সীমারেখার বহির্ভূত। হয়তো কাজটা মুবাহ বা বৈধ হবে; তখন সে-কাজের জন্য সে সওয়াব পাবে না এবং সেটা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে না। অথবা কাজটা সুন্নাত হবে, তখন সেটা করলে সওয়াব মিলবে, না করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কিংবা কাজটা ফরজ পর্যায়ভুক্ত হবে, তখন সেটি পালন করলে সওয়াব মিলবে; না করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। হয়তো কাজটা মাকরুহ বা নিন্দার পর্যায়ভুক্ত হবে, তখন না করলে সওয়াব মিলবে; কিন্তু করে ফেললে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কিংবা কাজটা হবে হারাম, না করলে সওয়াব পাবে। আর করে ফেললে শাস্তি পাবে। দুনিয়ার যত কাজ-কর্ম, লেনদেন, সামাজিকতা, রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালনা সবকিছু এই পাঁচ নীতির আওতাধীন। হয় ফরজ পর্যায়ভুক্ত, না হয় মুস্তাহাব পর্যায়ভুক্ত, নয়তো মুবাহ অথবা মাকরুহ কিংবা হারাম পর্যায়ভুক্ত।

কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলিম কখনো এমন কথা বলতে পারে না যে, এই বিষয়টা ধর্মের গণ্ডির
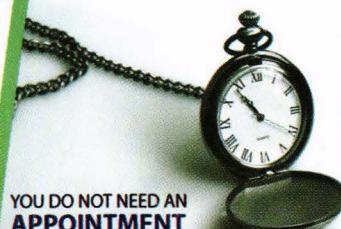
YOU DO NOT NEED AN APPOINTMENT TO TALK TO ALLAH. HE IS AVAILABLE TO LISTEN TO YOU 24/7.

মধ্যে পড়েনি। বলতে পারে না যে, ধর্মের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অনুরূপ তার একথা বলাও উচিত হবে না যে, ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই এবং ইসলামে রাজনীতির কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ রাজনীতি ইসলামেরই একটি অংশ। সূরা তাওবা ও সূরা আনফালের পুরোটা জুড়ে জিহাদ, রাজনীতি ও প্রশাসনিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই কুরআনের কোনো অংশকে যেমন কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি-বিধানকেও ইসলাম থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

একজন প্রকৃত মুসলিমকে আরও জানতে হবে যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থা হলো সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা। রোমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চেয়ে ইসলাম অনেক বেশি উত্তম ও পরিপুষ্ট। যে রোমান সমাজব্যাবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ইউরোপের দেশসমূহের সমাজ, শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, বিচার বিভাগীয় ও সাংবিধানিক যত নীতি-বিধান প্রয়োজন সব ইসলামি শরীয়তের আলোকে প্রণয়ন করা। ধর্মের বিধিনিষেধ মেনেই সেগুলো প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়।

এটাও জানতে হবে, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও অস্বীকার করবে, কিংবা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের কোনো একটি মানতে অস্বীকৃতি জানাবে, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

প্রকৃত মুসলিমকে এটাও জানতে হবে যে, দ্বীনের শাখাগত মাসআলায় ইজতিহাদ করা শরীয়তের প্রার্থিত বিষয়। এর পেছনে মেধা ব্যয় ও সময় দেওয়ার কারণে মুজতাহিদ প্রতিদানের হকদার হন। তার ইজতিহাদ ভুল হলেও। তার ইজতিহাদ সঠিক হলে তিনি দুটো প্রতিদান

পাবেন। একটা ইজতিহাদের জন্য, অন্যটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য। সাথে সাথে এদিকেও লক্ষ রাখতে হবে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলিতে ইজতিহাদ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, সেসব বিষয় কুরআনের আয়াত ও অকাট্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর কোনো বিষয়ের সমর্থনে কুরআনের আয়াত ও হাদীস থাকা অবস্থায় ইজতিহাদ করার বৈধতা শরীয়ত দেয় না।

প্রকৃত মুসলিম এটাও জানবে যে, শাখাগত মাসআলায় ইমামদের মতানৈক্যের কারণে সাধারণ মানুষ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। হোক সে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী বা হাম্বলী; বরং ইমামদের ইখতিলাফ ও মতানৈক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ এবং সেটা আমলের সীমানাকে বিস্তৃত করে। পক্ষান্তরে কেউ যদি ঈমান-আকীদার মতো দ্বীনের মৌলিক বিধানে ইজতিহাদ করতে চায়, তাহলে তা সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে মুজতাহিদদের একজন সঠিক সীদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। বাকিরা ভুল করবে। কেননা, একই বিষয়ের সত্য কখনো বিভিন্ন রকম হতে পারে না। আর সঠিক সিদ্ধান্তে তিনিই উপনীত হতে পারবেন, যিনি নবী সা.-এর সুন্নতের অনুসরণ করবেন এবং খাইরুল কুরুনের অনুসৃত পথে চলবেন।

মুসলিম আরও জানবে, যে ব্যক্তি স্বাক্ষ্য দেয় যে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসুল’ এবং সে কুরআন সুন্নাহর বিপরীত কোনো আকীদায় বিশ্বাস করে নাড় তা ছাড়া সে শরীয়ত নির্ধাতির হালালকে হালাল জানে, হরামকে হারাম মানেড়সে-ই মুসলিম। তার উপর আরোপিত হবে ইসলামের হুকুম আহকাম। সকল মুসলমানের ভাই বলে বিবেচিত হবে সে।

যদি কোনো মুসলিম দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয়কে অস্বীকার না করে এবং এমন কোনো কাজ না করে, যার উপর উলামায়ে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সে কাফের; তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না।

একজন প্রকৃত মুসলিম আরও জানবে যে, ইসলাম কোনো উপকারী বিষয় ও জ্ঞান-বিদ্যার বিরোধিতা করে না। উপকারী শিল্পকর্ম থেকেও কাউকে নিরুৎসাহিত করে না। সুস্থ সংস্কৃতি পালনেও কাউকে বাধা দেয় না। ইসলাম

হলো স্থায়ী, বিস্তৃত ও স্বভাবজাত ধর্ম। যার মধ্যে নেই কোনো কাঠিন্য, অসারতা ও সংকীর্ণতা।

প্রকৃত মুসলিমকে এই বিশ্বাসও রাখতে হবে যে, এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। যিনি অনাদি ও অনন্ত। যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী। পূর্ণতার সব গুণে তিনি পরিপূর্ণ। অপূর্ণতার সব ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত। তিনি সবকিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। সবকিছু তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।

আমাদেরকে এবাদত করতে হবে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে; তাঁর ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রেখে। জানতে হবে, তিনি সবকিছু দেখছেন। তিনি ভালো-মন্দ সব কিছুর স্রষ্টা। তাঁর হাতেই রয়েছে কল্যাণের চাবিকাঠি। তিনি যা চান, তাই করতে সক্ষম। সুতরাং এবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। জীবনযাপনের সমস্ত উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনের জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে। তিনি ছাড়া কারও কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। শুধু তাঁকে ভয় করতে হবে। মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তাকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না।

বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ তাআলা সব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সবাইকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। সেগুলোর মধ্যে কিছু প্রকাশ্য উপাদানে সৃষ্ট। যেমন মানুষ, প্রাণীকুল, তারকারাজি ইত্যাদি। কিছু হলো নুরের তৈরি। যেমন, ফেরেশতা। তারা খায় না এবং পান করে না। আল্লাহর কোনো আদেশের অবাধ্য হয় না। তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তাই করে। দিন রাত তারা আল্লাহর প্রশংসার তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত থাকে। সামান্য সময়ও তারা নষ্ট করে না।

তাঁর আরেক প্রকার সৃষ্টি হলো জিন। তারা মানুষকে দেখতে পায়। কিন্তু মানুষ তাদের দেখতে পায় না। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলিম ও বাধ্য। কিছু কাফের ও অবাধ্য।

সৃষ্টির অন্য এক প্রকার হলো শয়তান। তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

মুসলিম বিশ্বাস করবে যে, কতক ব্যক্তিকে বিশেষ মর্যাদা-দানের মাধ্যমে

আল্লাহ মানুষের উপর আনুগ্রহ করে থাকেন। তিনি মানুষের মধ্য থেকে কতককে নির্বাচন করেন। কবীরা গোনাহ থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখেন। মানবিক অপূর্ণতা থেকে পরিশুদ্ধ রাখেন। তাদের কাছে জিবরীল আ.-কে পাঠান। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও রিসালাত পৌঁছে দেন। তারপর আসমানী দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কওমের কাছে ঐশী বাণী পৌঁছে দেন। তারাই হলেন নবী ও রাসুল–প্রেরিত আল্লাহর দূত। তাদের প্রথমজন হলেন আদম আ.। আর শেষজন হলেন মুহাম্মাদ সা.।

আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে দুনিয়ার বুকে এত এত নবী না পাঠিয়ে একজনকে প্রেরণ করতে পারতেন। তার মাধ্যমেই জীবন-বিধানের পূর্ণতা দান করতে পারতেন। যে জীবনব্যবস্থা মানব সমাজের জন্য হয়ে থাকত অলঙ্ঘনীয় সংবিধান। কিন্তু হেকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হলো, প্রতিটি জিনিস ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে পূর্ণতায় পৌঁছে। যেভাবে কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি একদিনে পূর্ণতা পায় না। কালের বিবর্তনে ও সময়ের পরিক্রমায় আস্তে আস্তে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়। সে হিসেবে প্রত্যেক নবী তার পূর্বে প্রেরিত নবী থেকে পূর্ণ শরীয়ত নিয়ে দুনিয়ায় দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। এভাবে অপূর্ণ থেকে পূর্ণ হতে হতে পরিপূর্ণ জীবনবিধান নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মাদ সা. আবির্ভূত হন। তাই রিসালাতে মুহাম্মাদীর পর অন্যকোনো শরীয়তের প্রয়োজন নেই। এর কারণ মূলত দুটি। প্রথমত যুগের দাবি সামনে রেখে অমৌলিক মাসাআলার পরিপুষ্টিদান হচ্ছে রিসালতে মুহাম্মাদীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে নতুন ও আধুনিক মাসআলার উদ্ভব ঘটে। ইসলামী গবেষকগণ তার সমাধান তুলে ধরেন। ইসলামী গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ এমন পাণ্ডিত্য দেখান, মনে হয় যেন আসমান থেকে নতুন করে এই যুগের

দাবি মতো বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে। তাই রিসালাতে মুহাম্মাদীর পরে নতুন কোনো ধর্মমতের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।

দ্বিতীয়ত সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে পছন্দ করে। বিপদ-আপদে একে অন্যের পাশে দাঁড়ায়। অপরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে ইসলামের উষাকাল থেকে মানুষের ঐক্য আরো সংহত হয়েছে। যেন সবাই একই পরিবারভুক্ত। প্রাচ্যের কোনো অঞ্চল থেকে কেউ আওয়াজ তুললে তা পাশ্চাত্যের কোণে কোণে পৌঁছে যেতে সময় লাগে না। মানবসমাজে নিজেদের মাঝে গড়ে ওঠা ঐক্যের কারণে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোও সহজ হয়ে গেছে। নতুন কোনো বিষয়ে ফতোয়া জারি হলে অল্প সময়ে তা সবার কাছে পৌঁছে যায়। ভিন্ন ভিন্নভাবে সবার কাছে গিয়ে আমলের তাগিদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাই রিসালাতে মুহাম্মাদী থাকতে অন্য কোনো ধর্মমতের প্রয়োজনই হয় না।

একজন প্রকৃত মুসলিম আরও বিশ্বাস করবে, ওহী প্রেরণের অর্থ হলো আসমান থেকে আল্লাহর বার্তা নিয়ে জমীনে ফেরেশতার অবতরণ। কবি-সাহিত্যিকদের মননে যেমন ভাবের উদ্ভাস ঘটে, ওহী অন্তরে উদ্ভাসিত তেমন কোনো মনোভাবের নাম নয়। মেহনত-মুজাহাদা, চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে ওহী লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন, তার কাছে ওহী প্রেরণ করেন। তাই এমনটা বলা কখনোই উচিত হবে না যে, নবীগণ হলেন একেকটি প্রতিভা। মহাকবি, অনেক বড় দার্শনিক–কোনো সাচ্চা দিল মুসলমান কখনো এমন কথা বলতে পারে না। কেননা, এসব কথাবার্তা নবুয়তের মর্যাদা ও শানের খেলাফ, ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী। এসব কথার মাধ্যমে একজন নবীকে তার মর্যাদা থেকে অনেকখানি নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়।

“The world is a prison-house for a believer and Paradise for a non-believer.”
[Muslim]

সমস্ত নবী-রাসুলের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা চারজন রাসুলের ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। মুসা আ.-কে দিয়েছেন তাওরাত। দাউদ আ.-কে দিয়েছেন যাবুর। ঈসা আ.-কে দিয়েছেন ইন্‌জীল। আর মুহাম্মাদ সা.-কে দান করেছেন কুরআন। কিন্তু প্রত্যেক কওম তাদের কাছে প্রেরিত কিতাব বিকৃত করে ফেলেছে। নিজেদের মনগড়া অনেক কিছু জুড়ে নিয়েছে আসমানী কিতাবসমূহে। একমাত্র কুরআন আপন অবস্থায় বহাল রয়েছে। যেভাবে আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক সেভাবেই আছে। একটি হরফ বা নুকতারও কমবেশ হয়নি। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআনের মর্ম অনুধাবনকে সহজ করে নাজিল করেছেন এবং নিজেই এর হেফাজতের জিম্মাদারী নিয়েছেন। 'নিঃসন্দেহে আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণের জিম্মাদার।'

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটাবেন এবং তাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্র করবেন। যদিও তাদের দেহ পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাক কিংবা আগুণে পুড়ে ছাই হয়ে যাক, পাখি তাকে ঠুকরে খেয়ে ফেলুক বা হিংস্র প্রাণী তাকে ছিঁড়ে খেয়ে হজম করে ফেলুক। হাশরের ময়দানে তাকে সবার সাথে উঠে দাঁড়াতেই হবে। তারপর সেখানে দুনিয়ায় কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। পুণ্যবানদের প্রতিদান দেয়া হবে। তারা স্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর পাপীদের শাস্তি দেওয়া হবে। তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা কখনো শিরকের গোনাহ মাফ করেন না। শিরকের চেয়ে নীচের গোনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে দেন।

কৃত পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে যে মৃত্যুর আগে নেক দিলে ও ভবিষ্যতে তা না করার অঙ্গীকারের সাথে তওবা করবে, সে বেগোনাহ মাসুম হয়ে যাবে। এটা হলো সত্য তওবা–যা সব পাপ মুছে দেয়। একবার তওবা করার পর যদি কেউ পাহাড় সমান গোনাহ করে ফেলে এবং দ্বিতীয় বার আবার অকপটে তওবা করে আল্লাহ তাকেও মাফ করে দেন। 'আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে তিনি সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন।'

তবে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে তওবা করেছে; কিন্তু কাজটা সে করেই যাচ্ছে অথবা করবে বলে ভাবছে, তাহলে এটা হবে আল্লাহর সাথে কপটতার আশ্রয় নেয়ার শামিল। আল্লাহ সবাইকে এমন কাজ থেকে হেফাজত করুন।

একজন মুসলিম আরও বিশ্বাস করবে যে, মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহর কুদরতী হাতের আওতাধীন। আল্লাহ মানুষের সৌভাগ্য ও মন্দভাগ্য নির্ধারণ করেন। তিনি প্রত্যেকের আয়ু ও রিজিক বণ্টন করে দেন। যার জন্য যেটা নির্ধারিত, হাজার বাধা সত্ত্বেও তার কাছে সেটা আসবে। অন্যের জন্য যেটা নির্ধারণ করা হয়েছে, দুনিয়ার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেও কারও পক্ষে সেটা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারও হায়াতের কিছু অংশ যদি বাকি থেকে যায়, বিশ্ববাসী সবাই মিলেও তাকে মৃত্যুদান করতে পারবে না। আবার কারও মৃত্যুর সময় এসে গেলে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালও তাকে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গেছে। আল্লাহর সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কখনো আল্লাহর সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না।

এসব কিছু জানা ও মানার পর যে কেউ মুসলিম হিসাবে আখ্যায়িত হবে। সে অন্তরে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসুল। সালাতের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের প্রতি যত্নশীল হয়ে অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে সময়মত সালাত আদায় করবে। পূর্ণ বিশ্বাস ও সংযমের সাথে, সওয়াবের নিয়তে রোজা রাখবে। নিজ থেকে সচেষ্ট হয়ে প্রফুল্ল চিত্তে যাকাত আদায় করবে এবং সামর্থ্যবান হলে হজ আদায় করবে।

সে মিথ্যা বলবে না। গিবত করবে না। মন্দ কথা বলবে না। কারো উপর জুলুম করবে না। চোখ, হাত ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করাসহ সমস্ত গোনাহ থেকে মুক্ত থাকবে। উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে সচেষ্ট হবে। যেখান থেকেই হোক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের চেষ্টা করবে। নিজের যেটা পছন্দ, অন্যের জন্য সেটাই পছন্দ করবে। মন্দ ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকবে। ভালো ও উত্তম কাজে এগিয়ে যাবে। সামর্থ্য থাকলে হাতের সাহায্যে মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে। তা না পারলে মুখের ভাষায় অন্যায়ের বিরোধিতা করবে। সেটাও না পারলে অন্তরে অন্তরে মন্দ কাজকে ঘৃণা করবে। যদিও

সেটা ঈমানের দুর্ববলতার পরিচায়ক। মানুষের প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে আদায় করবে। দুর্বলদের সাহায্য করবে। দরিদ্রদের সহায়তা করবে। অসুস্থদের সেবা করবে।

পর-নারী থেকে চোখ হেফাজত করবে। মুসলমানদের সম্পদ সংরক্ষণ করবে। বৃদ্ধ লোককে নিজের বাবা মনে করবে। সমবয়সীকে ভাই ও ছোটদেরকে সন্তানের চোখে দেখবে। মহিলাদেকে নিজের বোন ও তরুণীদের নিজের মেয়ে মনে করবে।

মদ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। সুদী লেনদেন করবে না। ঘুষ দেবেও না; নেবেও না। হারাম কাজ করবে না। হারাম কাজ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্দেহজনক বিষয় থেকেও দূরে থাকবে।

ইসলামে দাওয়াত : পন্থা ও পদ্ধতি

হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত এবং আমাদের সকলের জানা 'আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের ভিতর প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন একজন ব্যক্তি প্রেরণ করেন, যিনি উম্মতের জন্য দীনকে সংস্কার করে থাকেন।' দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন শহরে অনেক মুজাদ্দিদের আগমন ঘটেছে, অনেক দায়ী আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমি তাদের অনেকের জীবনী অধ্যয়ন করেছি। তাদের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেছি। তাদের দাওয়াতের পন্থা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি ও দেখেছি, তাদের সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। তাদের লক্ষ্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ। তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম উম্মাহকে দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করণ। যদিও তাদের একেক জনের কর্মপন্থা ও দাওয়াতের পদ্ধতি একেক রকম ছিল। প্রত্যেক দায়ী দীনের দাওয়াতের জন্য এমন কর্মকৌশল গ্রহণ করেছিলেন, যার সাহায্যে তারা সহজে লক্ষ্যে

পৌঁছতে পারেন। আমি মুজাদ্দিদ ও দায়ীগণের দাওয়াতের পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেছি এবং দেখেছি, অনেক ভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও তাদের দাওয়াতে ছয়টি বিষয় এক ধারায় এসে একাকার হয়ে গেছে। এই ছয়টি ধারা থেকে অনেক শাখা-উপশাখা বের হয়েছে, তবে মূল বিষয় হলো ছয়টি।

দাওয়াতের পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি : দাওয়াতের মাধ্যমে রাজা বা শাসকদেরকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। এক্ষেত্রে দায়ীর উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে বাদশা ও শাসকদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং এর পেছনেই সময় ব্যয় করা। এ বিষয়ে মেহনত-মোজাহাদা করা। এই পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী আহমাদ সিরহিন্দী রহ.। যখন মোঘল বাদশা আকবর দ্বীনে এলাহী নামে একটা নতুন ধর্ম প্রণয়ন করে কুফরে লিপ্ত হয়েছিলেন। যখন তিনি মানুষকে সেই ধর্ম মানতে বাধ্য করে কুফরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। বাদশা দেশ থেকে ও দেশের মানুষের অন্তর থেকে ইসলাম মুছে ফেলার চেষ্টায় মেতে উঠছিলেন; তাকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। সেনাবাহিনী ছিল তার অধীনে। সর্দাররা ছিল তার সমর্থক। শাসনক্ষমতা ছিল তার একচ্ছত্র অধিকারে এবং ধনভাণ্ডার ছিল তার কুক্ষিগত। এতসব ক্ষমতার মোকাবেলায় সাধারণ জনগণ ছিল অসহায়।

তারা বাদশাহকে মন্দ কাজ পরিহার করার পরামর্শ দিতে সাহস পেত না। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারত না। এমন কঠিন ও সঙ্গীন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এলেন দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ আহমাদ সিরহিন্দী রহ.। তিনি বাদশা ও তার সভাসদদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললেন। তার অন্তরে বিশ্বাস ছিল– একদিন

না একদিন তাদেরকে তিনি ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। আহমাদ সিরহিন্দী রহ. এবং তারপর তার সন্তান-সন্ততি ও শাগরেদরা রাজ দরবারের সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখলেন। তাদেরকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট থাকলেন এবং একদিন তাদের এই দাওয়াত ও মেহনতমুজাহাদা আশ্চর্যজনক সুফল বয়ে আনল। কাফের মুরতাদ বাদশা আকবরের বংশে এমন এক সম্রাটের আবির্ভাব ঘটল, যিনি ছিলেন তৎকালীন ইসলামী বিশ্বে অদ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন খুব নীতিবান ও মুত্তাকী। তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী, সংশোধনে আগ্রহী। তিনি খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত। তিনি আলমগীর ইবনে শাহজাহান ইবনে জাহাঙ্গীর ইবনে আকবার। দাওয়াতের এই পদ্ধতিতে সময় কম ব্যয় হয়, উপকার দ্রুত ও অধিক পাওয়া যায়। তবে এর উপকার ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ বাদশাহ জীবিত থাকেন। কোনো কারণে যদি শাসক ক্ষমতা হারান বা মারা যান, তখন দাওয়াতের প্রভাব শেষ হয়ে যায়।

দাওয়াতের দ্বিতীয় পদ্ধতি

শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ মানুষের মাঝে দাওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া। সেক্ষেত্রে বাদশাহ তার ক্ষমতা ও প্রতিপ্রত্তি দ্বারা দাওয়াতের প্রচার প্রসারের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করেন এবং দাওয়াতের পথে কোনো বাধা-বিপত্তি এলে তা দূর করে দেন। তিনি এর পৃষ্ঠপোষক হয়ে থাকেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে নজদে দাওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.। তিনি দাওয়াতের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন বাদশাহ সউদের পূর্বপুরুষরা তার সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন। দাওয়াতের প্রচার প্রসারে ও বিস্তৃতির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং দীর্ঘ মেয়াদি সাহায্য সহযোগিতা ও দীর্ঘস্থায়ী মেহনতের দ্বায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

তৃতীয় পদ্ধতি

সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী সম্রাজ্য কায়েম করা। এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন হিন্দুস্তানের সাইয়েদ আহমাদ ইবনে ইরফান শহীদ রহ.। তার

নেতৃত্বে তার অনুসারীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন এবং উত্তর ভারতের একটা অঞ্চল থেকে ইংরেজদের হটিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্য কায়েম করেন। আহমাদ ইবনে ইরফান রহ. সেখানে কুরআন-সুন্নাহর শাসন কায়েম করেন। একদিন হয়তো তার এই সম্রাজ্যের সীমানা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু ইংরেজদের ধূর্তামির কাছে তাকে পরাজিত হতে হয়। সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে তারা কখনো-ই সফল হত না। ইংরেজরা ভারতের শক্তিশালী গোত্রসমূহকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, 'এরা হলো ওয়াহাবী; এখনই এদের দমন না করা হলে একদিন তারা সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করে নেবে। তোমাদেরকেও গোলাম করে রাখবে।' ইংরেজদের এই চক্রান্তের ফলাফল হয় খুবই মর্মন্তুদ। উদীয়মান একটি ইসলামী সম্রাজ্যের কবর ভারতবাসী নিজ হাতেই রচনা করে। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে তারা ভারতকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়।

ফিলিস্তীনের ইয্যুদ্দীন কাস্সাম রাহ.-ও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি লজ্জার বিষয় মনে করতেন যে, ছাত্রদেরকে জিহাদের আহকাম পড়াবেন এবং তাদেরকে বলবেন, 'কোনো অমুসলিম বাহিনী যখন কোনো মুসলিম ভুখণ্ডে হামলা করে, তখন দুনিয়ার সমস্ত মুসলিমের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়'-এই পাঠ দান শেষে তিনি ঘরে ফিরে আসবেন; ভাত-গোস্তের পেয়ালা নিয়ে বসে পড়বেন; গ্রিন টি-র কাপে চুমুক দিবেন; নরম বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাবেন! ইয্যুদ্দীন কাসসাম রাহ. নিজেকে এমন দ্বিচারিতা থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তিনি নিজে সামরিক প্রশিক্ষণ নেন। তার সঙ্গীদেরও সামরিক প্রশিক্ষণ দেন। তারপর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি অস্ত্র ধারণ করেন। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য আমরণ জিহাদ অব্যাহত রাখেন। জিহাদের ময়দানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইয্যুদ্দীন কাসসাম রাহ. শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু ফিলিস্তীনী মুসলিমদের মুক্তির যে পথ দেখিয়ে গেছেন তা কেউ কোনো দিন ভুলতে পারবে না। ফিলিস্তীনের মুক্তির জন্য তিনি সবার আগে অস্ত্র তুলে নেন। তার দেখানো পথ ধরে ১৯৩৬ সালে সৈন্য স্বল্পতা ও অস্ত্র স্বল্পতা সত্ত্বেও ফিলিস্তীনীরা এমন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে, যার দ্বিতীয়

কোনো নজির দুনিয়ার ইতিহাসে নেই। ফিলিস্তীনের জনগণ যদি সসস্ত্র জিহাদের দ্বায়িত্ব কাঁধে তুলে না নিতো, বরং জিহাদ ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকতো, তাহলে হারানোর পরেও যেটুকু আছে সেটুকুও হারাতে হত। ফিলিস্তীনের চি□হ্নও পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যেত।

দাওয়াতের চতুর্থ পদ্ধতি

বিরোধীদের সাথে কোনো ঝগড়া বিবাদ ও হাঙ্গামায় লিপ্ত না হয়ে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে, পথে-প্রান্তরে নিজের মত ও মতাদর্শের প্রচার করা এবং মানুষের সামনে এর বাস্তবতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজন তুলে ধরা। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াত দিয়েছেন জামালুদ্দিন আফগানী। এ বিষয়ে তাঁর প্রশিদ্ধ উক্তি হলো, 'তুমি তোমার কথা বলো। তারপর কে কী বলছে, সেদিকে কান না দিয়ে নিজের মত চলে এসো।' এ পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন আরেক জন ব্যক্তি। তিনি তাহের আল জাযায়িরী। তবে তার দাওয়াতের পদ্ধতিটা ছিলো একটু ভিন্ন রকম। তাঁর সামনে কেউ তাঁর মতবাদের বিরোধিতা করলেও তিনি বিবাদে লিপ্ত হতেন না। বরং তিনি তাঁর সাথেও বিনয়ী আচরণ করতেন। তখন তিনি জানা বিষয়ও না জানার ভান করতেন। পরবর্তীতে বিরোধী ব্যক্তির কাছে এমন একটা বই নিয়ে হাজির হতেন, যে বইয়ে তার আপত্তির জবাব উল্লেখ রয়েছে। তিনি তাকে বলতেন, এই বইটা আমি আমার লাইব্রেরীতে পেয়েছি। আশা করি আপনি এই বইটি পড়ে আমাকে বলবেন, এই বইটা আমার পড়ার উপোযোগী কী না। যদি আমার জন্য উপকারী এতে কিছু থাকে, তাহলে আমি বইটা পড়বো, অন্যথায় পড়বো না। এ কথা বলে তিনি বিরোধী ব্যক্তির কাছে বইটি রেখে চলে আসতেন। কিছু দিনের মধ্যে বিরোধী ব্যক্তির বইটা পড়া হয়ে যেতো এবং সে তার বিরোধিতা ত্যাগ করত।
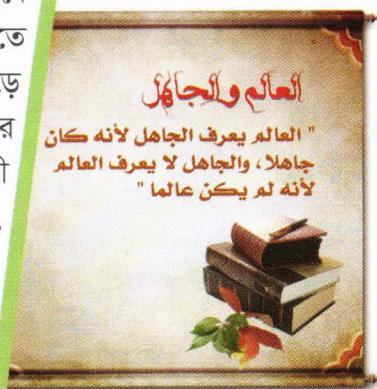
এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে নিশ্চিত ভালো ফলাফল আশা করা যায়। কিন্তু এর জন্য দরকার হয় দীর্ঘদিনের সাধনা ও অধ্যয়ন।

পঞ্চম পদ্ধতি

শিক্ষা ও পাঠদান, ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচনা, প্রাচীন ও উপকারী গ্রন্থসমুহ প্রকাশ করার মাধ্যমে দ্বীনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। দাওয়াতের এই পথ যারা অবলম্বন করেছেন, তাদের কয়েকজন হলেন ভারতের শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রাহ., মিশরের শায়খ আবদুহু ও শায়েখ রশীদ রেজা ও আলজেরিয়ায় শায়খ আব্দুল হামীদ ইবনে গুদাইস।

দাওয়াতের ষষ্ঠ পদ্ধতি

পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বক্তৃতা উপস্থাপনের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান। মুহিববুদ্দীন আল খতীব ছিলেন এই পথের মানুষ। মিশরে ইসলামী রেনেসাঁর পুরোধা ব্যক্তি। তিনিই প্রথম লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন এবং ইসলামী আদর্শ সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ করে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর পৈত্রিক ছাপাখানা ইসলামী আন্দোলনের সহায়তার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আল ফাতহ' ছিলো মিসরে প্রকাশিত প্রথম ইসলামী পত্রিকা। শায়খ শাকিব আরসালানও লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের প্রথম ইসলামী লেখক।

# # #

অধুনা ইসলামী বিশ্বে দাওয়াতের ময়দানে দু'টি দল সক্রিয় রয়েছে– তাদের প্রচার ও পরিচিতি ব্যাপক। এই দল দু'টিই ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে বিবেচিত হচ্ছে। যার একটির উৎপত্তি ও পীঠস্থান হলো ভারতবর্ষ। অন্যটির পীঠস্থান হলো মিসর। এখানে একটি কথা না
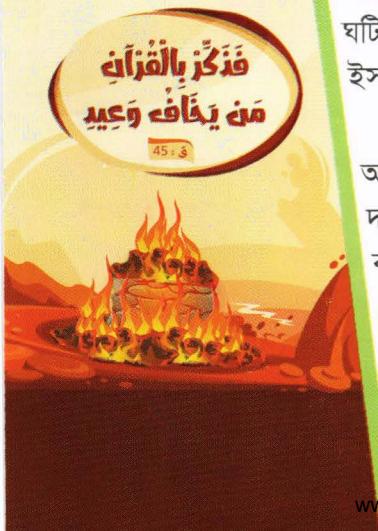
বললেই নয়। আমার মতে ইসলামী দল সমূহের মধ্যে সবচেয়ে সংঘটিত, ইসলামের প্রতি সবচেয়ে একাগ্র ও একনিষ্ঠ দল হলো মওদুদী সাহেব প্রতিষ্ঠিত জামাতে ইসলামী। যদিও তাঁর অনুসারীর সংখ্যা খুব সামান্য। তাই এদের নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না। ইসলামী বিশ্বে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সক্রিয় দু'টি দলের একটি হলো শায়খ ইলিয়াস রাহ. কতৃক ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত জামাতে তাবলীগ বা তাবলীগ জামাত। শায়খ ইলিয়াস রাহ. প্রথম তাঁর কিছু ছাত্র নিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছিলেন যে, তারা সামান্য সময়ের জন্য হলেও দাওয়াতের মেহনতে বের হবে। হোক সেটা সপ্তাহে একঘন্টা, কিংবা মাসে একদিন বা বছরে একমাস অথবা সারা জীবনে চার মাস। জামাতে তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা নিজ খরচে দাওয়াতের মেহনতের জন্যে দেশ-বিদেশে সফর করেন। কারো কাছ থেকে তারা বিনিময় দাবি করেন না। কেউ স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলেও তা গ্রহণ করেন না। তারা মুসলিমদেরকে আল্লাহর পথে চলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। মুসলিমদের কাছে আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছে দেন। বর্তমান সময় ও সমাজের অবস্থা এমন– যেখানে অমুসলিমদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার চেয়ে মুসলিমদের কাছে আমলের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন অনেক বেশি। জামাতে তাবলীগের দাওয়াতী কার্যক্রম শুধু ভারত উপমহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং বিশ্বের দেশে দেশে এর কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে। ইরাক, সিরিয়া, মিসরেও তারা পৌঁছে গেছে। আমি জামাতে তাবলীগের অনেক লোককে দেখেছি। তারা পায়ে হেঁটে মক্কা থেকে মদীনা যাচ্ছেন। মক্কা থেকে ইয়েমেন যাচ্ছেন। পথে থেমে থেমে মরুবাসী বেদুইনদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন। ইসলামের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। অথচ এই আরব বেদুইনদের মধ্য থেকেই ইসলাম উদ্ভাসিত হয়ে দুনিয়ার দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তারাই আজ ইসলামকে ভুলে গেছে। তাদেরকে আজ ইসলামের দীক্ষা দিচ্ছে ভারতবর্ষের তরুণরা, যারা কর্মের প্রতি একনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ। যাদের ইচ্ছাশক্তি অদম্য। যাদের অধ্যবসায় একাগ্র। বড় পরিসরে ইসলামী দাওয়াত প্রচারক অন্য দলটির পরিচয় একটু বিশদভাবে তুলে ধরবো। তাদের কর্মপন্থা ও

পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো। তাদের কাছে আমার চাওয়া এবং তাদের বিষয়ে আমার আশঙ্কা তুলে ধরবো।

কর্মপন্থা

দাওয়াতের ছয়টি পদ্ধতির শেষ তিনটির সমন্বয়ে তারা এ ময়দানে বিদ্যমান। এ ছাড়াও তারা প্রথমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দাওয়াতের উপর জোড় দিয়ে থাকেন। কোনো অনুষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বাসে, ট্রেনে বা চলার পথে দু'একটি কাজ ও সামান্য কথার মাধ্যমে দাওয়াতের সূচনা করেন। ধীরে ধীরে তার সাথে ওঠা-বসা করতে করতে গভীরে প্রবেশ করেন। দাওয়াতের এই পদ্ধতিই অবলম্বন করতেন শায়খ আফগানী ও শায়খ জাযায়িরী। কিন্তু শায়খ আফগানী বীজতলায় চারা বপন করে দায়িত্ব শেষ করতেন। বীজতলা পরিচর্যা করে তাতে অংকুর বের হওয়ার প্রতীক্ষায় তিনি থাকতেন না। তিনি মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করে অন্য কাজে মনোনিবেশ করতেন। তিনি শ্রোতার অন্তরের প্রতিক্রিয়া জানার অপেক্ষা করতেন না।

কিন্তু এই দলটির কার্যক্রম আরো বিন্যস্ত ও আন্তরিক। তারা জমীনে বীজ বপন করে দ্বায়িত্ব শেষ করেন না। বরং তারা বীজ বপন করার পর পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণ করেন। প্রয়োজনমত সার দেন, সেঁচের ব্যবস্থা করেন। একটা বীজ কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে তার স্থানে অন্য একটি বপন করেন। এভাবে অংকুর বের হয় এবং একসময় মহিরুহ হয়ে আসমান জুড়ে দাঁড়িয়ে যায়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক দাওয়াতের ক্ষেত্রেও তারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। দাওয়াতের মাধ্যমে কারো অন্তরে ইসলামের বীজ বপন করে তারা হারিয়ে যান না। বরং তারা তাকে সঙ্গ দেন; তার চিন্তাকে ভাবনায় পরিণত করেন। একসময় সেটা বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। এভাবে নিবিড় পরিচর্যা ও বিন্যাসের মাধ্যমে তাদের দাওয়াতের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারণার পরে আসে সাংগঠনিক কার্যক্রম বা সাংগঠনিক সভা সমাবেশে উপস্থিতি ও নেতৃস্থানীয়দের বক্তৃতা শ্রবণ। বিভিন্ন গ্রন্থ ও ম্যাগাজিন থেকে ধারাবাহিক পঠন কার্যক্রম। যার মাধ্যমে সংঘঠনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের অন্তরে দাওয়াতের মর্মবাণী গভীরভাবে উপলব্ধি হতে থাকে।

তাই সবদিকে লক্ষ করে বলা যায়, এই সংগঠনটি হলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রচারণা, জ্ঞানমূলক প্রচারণা ও গণমাধ্যমের প্রচারণার সমষ্টিগত বৈশিষ্টে গুণান্বিত একটি সংগঠন। উপরে বিবৃত পদ্ধতিগত বিন্যাস করা হয়েছে মূলত বাহ্যিক কাঠামো বিবেচনা করে। কিন্তু মৌলিকভাবে এর গঠনতন্ত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সুস্পষ্ট ও মৌলিক তিনটি উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা চেষ্টা করছেন এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর সমষ্টিগতভাবে লক্ষ রেখে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে। সেই তিনটি মৌলিক উপাদান হলো:

ক. সুফী তত্ত্ব

সুফী তত্ত্ব বলতে ইবনে আরাবী বা শা'রানীর সুফীবাদ উদ্দেশ্য নয়। বরং ইমাম গাজালী রাহ. যে সুফীতত্ত্বের প্রবর্তন করেছেন তারা সেটাকে গ্রহণ করেছেন। দু'টি বিষয়ে লক্ষ করলে সংগঠনটিতে ইমাম গাজালীর সুফীবাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, সংগঠনটির গঠনতন্ত্রের বেশ কিছু ধারার সাথে ইমাম গাজালী প্রবর্তিত সুফীবাদের মিল রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সংগঠনটি নেতাদের আলোচনা, পর্যালোনা ও তাদের প্রণীত গ্রন্থাদিতে যে প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো সুফীবাদের দিকে ইঙ্গিত করে। বিশেষত সংগঠনটি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার স্মৃতিচারণমূলক রচনা সম্ভার পড়লেই বোঝা যায় তিনি কোনো একটি সুফীবাদী বলয়ে জন্ম নিয়েছেন এবং বেড়ে উঠেছেন।

খ. সালাফী মতবাদ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযীয়া রাহ. প্রণীত সালাফী মতবাদ। এদের সংগঠনে সুফীবাদের চেয়ে সালাফী তত্ত্বের প্রভাব অনেক বেশি। এসব তাদের কথাবার্তা থেকে যেমন বোঝা যায়, তেমনি তাদের
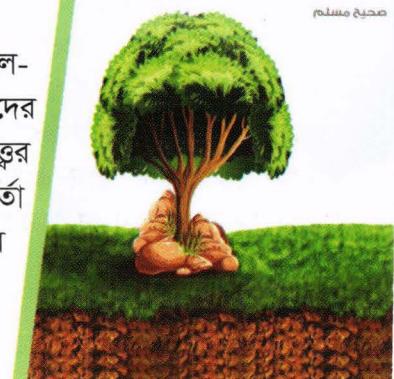
কাজকর্মেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা এবাদতের সাথে কোনো ধরনের বিদ'আতের সংমিশ্রণ ঘটায় না। সবকিছু আল্লাহর সত্ত্বা থেকে সৃষ্ট। কাউকে ওসিলা বানিয়ে দোয়া করা, কবরের সেহানে অবস্থান করা ইত্যাদির মত সুফীদের ভ্রান্ত আদর্শে তারা বিশ্বাস করে না। তাদের ধারণা হলো, কুরআন-সুন্নাহর উৎস থেকে নিঃসরিত শরীয়তের বাইরে গিয়ে যে হাকীকতের চর্চা করা হয়, সেটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা, পাগলের প্রলাপ, উম্মাদের উন্মত্ততা ও বিকারগ্রস্তের বকবকানি ছাড়া আর কিছু নয়।

গ. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণ

তারা ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটায়নি। বরং সংগঠনের বিজ্ঞ আলিমগণের দ্বারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার সমন্বিত রূপ এটি। 'আল আদালাতুল ইজতিমাইয়্যা ফিল ইসলাম' এর মত অনেক গবেষণা গ্রন্থ তারা প্রণয়ণ করেছেন। এসব গ্রন্থে যুবকদের জন্য রয়েছে সঠিক পথের সন্ধান ও নানাবিধ উপদেশ।

পরিবর্তিত আজকের এই সময়ে তিনটি মৌলিক আদর্শকে স্বস্থানে রেখে সংগঠনটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনটি বিপরীতধর্মী মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তারা নতুন কোনো আদর্শ ও মতবাদের জন্ম নিতে দেয়নি।

সংগঠনটির পরিচালকদের কাছে আমার পরামর্শ হলো, যেনো তারা সবসময় সতর্ক থাকে, চোখ কান খোলা রাখে। যে কোনো ছোট ও সামান্য ভুলও যেনো তাদের চোখ এড়িয়ে না যায়। আদর্শ পথ অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে সামান্য ভুল সংগঠনকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দিতে পারে। যেমনিভাবে কেমিস্টদের গবেষণার ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজনের চেয়ে কোনো পদার্থের মাত্রা বেশি হয়ে যায়, তাহলে পুরো গবেষণাকর্ম ভেস্তে যায়। তাই পদার্থের মত আদর্শের

বেশ-কমও সংগঠনের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যদি সুফীতত্ত্বের প্রভাব বেশী হয়, তাহলে তা সংগঠনের স্বকীয়তা রক্ষায় কতটা সহায়ক হবে, কিংবা আদৌ সহায়ক হবে কি না, বলা কঠিন। কেননা, সুফী মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা তাদের অনুসারীদের মাথায় জঘন্য কিছু ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। সেগুলো হলো, অনুসারীরা তাদেরকে ত্রুটি ও দোষমুক্ত মনে করবে। তাকে সবদিক থেকে স্বনির্ভর মনে করবে। সে যা করুক আবশ্যকীয়ভাবে তার সব কিছুর অনুসরণ করতে হবে। মৃত ব্যক্তির মত শায়েখ বা পীরের হাতে নিজেকে সোপর্দ করে দিতে হবে।

এসব মানতে গিয়ে অনুসারীরা পীরের পূর্বসূরীদের নিয়ে চিন্তা করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যক মনে করে। অথচ শরীয়তে এঁরা কোনো জরুরী স্তম্ভ নয় এবং এতে কোনো সওয়াব নেই। সময় ও বিষয়ের পাবন্দী করা, যুক্তির মধ্যে অনুধাবন করে নেতার অনুগত্য করার মত মুবাহ ও বৈধ কাজ। এতে সওয়াব ও গুনাহ কিছু নেই। অথচ তারা এই কাজটা জরুরী মনে করেই করছে। সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে যদি সালাফী মতবাদের প্রভাব বেশী হয়ে যায় তাহলে সেটা কয়েক দিক থেকে ক্ষতির কারণ হতে পারে। সালাফী মতবাদের অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে মাজহাবের অনুসরণ ছেড়ে দেওয়ার দুঃসাহস দেখায় এবং আমলের জন্য নিজের সুবিধা মত মাসআলা নির্বাচন করে।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় আমার বোধগম্য নয় যে, মানুষের মধ্যে কীভাবে এই ধারণা বদ্ধমুল হলো যে, বর্তমান সময়ে ইসলামী হুকুম-আহকামের উপর ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। মনে করা হয়, শরীয়াতের মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামদের ভাষ্যই শেষ কথা। সব ক্ষেত্রে মাজহাবের হুকুমই মেনে যেতে হবে। যদিও সেটা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নাও হয়। অথবা যদি এর বিপরীতে সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকেও, তবুও মাজহাবের হুকুম মানতে হবে!

এটা হয়তো পঞ্চাশ বছর আগের মাজহাবের অন্ধ অনুসারীদের জন্ম দেওয়া ধ্যান ও ধারণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সালাফী মতবাদের অন্ধ অনুসরণ করলে

নতুন করে জাহেরী মাজহাবের আবির্ভাব ঘটার অবকাশ তৈরি হয়ে যায়। অথচ আমরা জানি না, জাহেরী মাজহাব কী? কেন এই মাজহাব দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে গেছে।

আসলে এটা ছিলো এমন এক মাজহাব, দুনিয়াতে স্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই যার ছিলো না। আসলে এই মাজহাব শরীয়তকে সংকুচিত করে ফেলেছিলো। শুধু শরীয়তের নমনীয়তাটুকু বরণ করে নিয়েছিলো। এরা মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে মাসআলার বিস্তারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই জাহেরী মাজহাবকে নতুন করে দুনিয়াতে নিয়ে আসা মুসলিমদের জন্য মোটেই সুখকর নয়। কিংবা সালাফী মতবাদের প্রভাবের কারণে মুশাব্বিহদের আকীদার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কাও সৃষ্টি হয়। আর মুশাব্বিহদের আকীদা হলো খুব জঘন্য। তারা বলে, আল্লাহ হলো দেহকাঠামোর অধিকারী। আল্লাহর পানাহড় তারা দাবী করে, মানুষের মত আল্লাহরও হাত রয়েছে, আল্লাহ জড়দেহের রূপ নিয়ে আরশে উপবিষ্ট রয়েছেন। এছাড়াও তারা কুরআনের দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমুহের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করার চেষ্টা করে যে দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের ব্যাপারে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম কোন ব্যাখ্যা দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। এ বিষয়ে তারা নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যের উপরই বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ের আলেমরা এই শব্দগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। তারা এগুলোর রূপক অর্থ তৈরির চেষ্টা করেছেন। আরবী সাহিত্যে এসব শব্দ যে অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে তারা কুরআনের সেই শব্দগুলোর সেই ব্যাখ্যাই করেছেন।

পক্ষান্তরে যদি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে যায় এবং তা যদি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তাহলে সংগঠনের দাওয়াতের কার্যক্রম অনেক দিক থেকে ব্যাহত হবে। তখন দ্বীনী বিষয়ে আমল করার ক্ষেত্রে যুক্তিকেই প্রধান্য দেওয়া হবে। কুরআন হাদীসের উক্তির চেয়ে তাদের কাছে যুক্তির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। যুক্তিই তাদের কাছে হয়ে যাবে দ্বীন বোঝার সবচেয়ে বড় মানদণ্ড। যুক্তি হবে তাদের কাছে

শরীয়তের সবচেয়ে বড় দলিল। অথচ আকল বা বিবেকের কাজ হলো কুরআন হাদীস নিয়ে গবেষণা করা এবং বাস্তবতার সাথে এর খাপখাওয়ানোর জন্য সচেষ্ট থাকা। কিন্তু শরীয়তের আহকাম নিয়ে লাগামহীন ভাবনা ও গবেষণা ব্যক্তির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না এবং তা বিবেকের দাবিও নয়। এই সব সমস্যা ও শঙ্কা সত্ত্বেও আমি বলবো, এই সংগঠনটির দাওয়াতের পদ্ধতি দুনিয়ার সকল মুসলিমের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। এই সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ও অল্প দিনে এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এক আশ্চার্যজনক বিষয়। এই সংগঠনটির পরিচালকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচয় আছে। ১৯২৭ সাল থেকে তাকে আমি চিনি। মুহিউদ্দিন আল যাকিব যখন কতক যুবককে একত্র করেন এবং তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে আধুনিক আরবে প্রথম ইসলামী সংগঠন জামাইয়্যাতু শুব্বানুল মুসলিমীন প্রতিষ্ঠা করেন। শায়খ মাহমুদ শাকের, আব্দুল মুনইম খাল্লাদ, আব্দুস সালাম হারুন এর মত ব্যক্তিগণ তখন শুব্বানুল মুসলিমীনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই সংগঠনের পরিচালকও তখন শুব্বানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এমন একটি সংগঠন পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আমার কাছাকাছি বয়সের। একসময় তিনি উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে গিয়ে সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন। এই সংগঠন তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। তাই তিনি শুব্বানুল মুসলিমীনের সাথে সম্পৃক্ততা কমিয়ে দেন। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ছোট ছোট গ্রুপ করে লোকদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। এটা হলো বর্তমান দুনিয়ায় ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়া দাওয়াতী সংগঠনটির সূচনা। মাত্র তিরিশ বছর আগে একজন মাত্র ব্যাক্তির উদ্যোগে যে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো তা আজ সুবিশাল মহিরুহের রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার বুকে।

إن الاستغفار الهازل يا عباد الله هو غالب استغفارنا : مراسيم ميتة ، وشعارات عقيمة تتوالى و تتزاحم عليها الكلمات .

الاستغفار الفاعل هو الذي تهتز له القلوب من كل زلة أو خطأ ، وتقوى العزيمة بعده على لزوم الطاعة والانقياد لله .

د. عبد الواحد الادريسي.
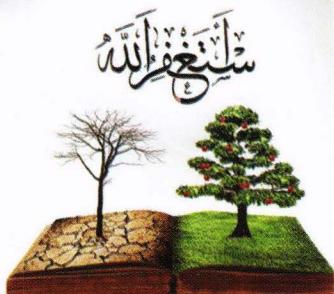
দাওয়াতের উপকরণ

মানুষের অন্তরে জন্ম নেয়া ঈমানের আলোকড়উদ্দীপনা, বিশেষত যে সব যুবকের অন্তর বস্তুবাদী জীবন ব্যবস্থা ক্লান্ত করে তুলেছে। যে যুবকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠ্যপুস্তক, এমন কি শিক্ষকদের কাছেও বস্তুবাদের শিক্ষা পেয়েছে। এবং আজ বুঝতে পেরেছে, জাগতিক ভোগ-বিলাসের স্বাদের সাথে ঈমানের স্বাদের কোনো তুলনা হয় না। আর বস্তুবাদে অভ্যস্ত জীবন কখনো আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ জীবনের সাথে তুল্য হতে পারে না। এই সব আত্মপ্রত্যয়ী যুবকেরা হলো সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার মূল উপকরণ। আল আজহার, জামইয়্যাতুশ শুব্বান, আল হিদায়াহ ও অন্যান্য সংগঠন এবং আলমানার ও আলমানার ম্যাগাজিনের প্রচেষ্টায় দাওয়াতের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, সেটা এই সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক বড় সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্বের মাধূর্যও এই দাওয়াতের জন্য অনেক বড় সহায়ক সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রবন্ধের কলেবর বড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। যদিও সেটা হয়ে যাবে ক্যানভাসে আঁকা ছবির মত, যাকে বিশ্লেষণ করলে হাজার পৃষ্ঠা লেখা যাবে। তিনি ছিলেন অনন্য সাতটি গুণের অধিকারী। তার ব্যাক্তিত্বে ছিলো বিনয়, অমায়িকতা, মেধা ও জাদুময়ী ভাষা। আর তার চরিত্র ছিলো অল্পতুষ্টি, দুনিয়াবিমুখতা ও ধৈর্যশীলতার সমন্বয়ে অনন্য।

১৯৪৫ সালে আমার কাছে সিরিয়ার এক প্রসিদ্ধ সাংবাদিক এল। যে মিসরের সব নেতাদের মুখোমুখি বসেছে, তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে।

সে এসে আমাকে বললো, আপনি তার সাথে আমার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করে দিন।

আমি বললাম, চলো আমার সাথে, তার সাথে

اشغل وقت الانتظار بالاستغفار

তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিবো।

আমার কথা শুনে লোকটি হতভম্ব হয়ে বললো, এভাবে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হবো?

আমি মিসরীয়দের মত করে বললাম, এতে অবাক হওয়ার এমন কি আছে? লোকটি বললো, আমি অনেক নেতার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু খুব সহজে তাদের কারো সাক্ষাৎ পাইনি। বারবার বিভিন্ন জনের মাধ্যমে আমাকে যোগাযোগ করতে হয়েছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়েছে। বিভিন্ন রকম এজেন্ট ও সেক্রেটারির সাথে সাক্ষাৎ করে সময় নিতে হয়েছে। আর এই ব্যক্তি হলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতা। আগাম সময় না নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হবো? তিনি কিছু মনে করবেন না?

আমি সিরীয় লোকটিকে নিয়ে তার কাছে গেলাম। তিনি আমাদের বন্ধুর মত বরণ করে নিলেন। আমাদের সাথে মধুর ভাষায় কথা বললেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করলেন। সিরীয় লোকটি সে দিন তার সরলতা, স্পষ্টবাদিতা, জ্ঞানের গভীরতা দেখে অবাক হয়েছিলো।

এমন অমায়িক মানুষ ছিলেন তিনি। সবাইকে তিনি আপন করে কাছে টেনে নিতে জানতেন।

তিনি ছিলেন বিরল মেধার অধিকারী।

প্রতিদিন বহু লোক তার সাথে সাক্ষাৎ করতো।

সবার নাম তিনি মনে রাখতেন।

তাদের পরিবারের হালাত জেনে নিতেন।

চাকরি-বাকরি ও কাজ-কর্মের খোঁজ-খবর নিতেন। এবং পরবর্তী সাক্ষাতের সময় তাকে নাম ধরে ডাকতেন। পরিবারের হাল-পুরসি করতেন।

তিনি একবার যেটা শুনতেন সেটা আর ভুলতেন না। এত এত লোকের নাম ঠিকানা আলাদাভাবে মনে রাখার আশ্চর্য যোগ্যতা আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন।

তিনি ছিলেন অনন্য শৈলীর একজন বক্তা।

আমি নিজেও একজন বক্তা। দীর্ঘ তিরিশ বছর যাবৎ আমি মিম্বরে বসে বক্তৃতা করছি।

আমি আরবদের বক্তৃতাশৈলী ও ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে ভালো করে জানি। আমি নির্ভরতার সাথে বলতে পারি, তার মতো অসাধারণ কোনো বক্তা আমার চোখে পড়েনি। জনতার সামনে বক্তব্য দেওয়ার জন্য তিনি অনন্য এক রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

তিনি ছিলেন দক্ষ আলোচক।

কথার মাঝে তিনি থামতেন না।

তোতলাতেন না।

মুখে কথা বাধতো না।

তার আলোচনা হতো সাবলীল।

দীর্ঘক্ষণ ধরে তার আলোচনা শুনলেও কেউ ক্লান্ত হতো না। শ্রোতারা বিরক্ত হতো না।

তিনি অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তৃতা করতেন।

তার কথায় থাকতো যুক্তির দ্যুতি, জ্ঞানের গভীরতা।

তিনি ছিলেন সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

তিনি নমনীয়তার সাথে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

আবার অনমনীয়তার সাথে কোমল হতে জানতেন।

কঠিন কঠিন বিষয়ে খুব সহজভাবে আলোচনা করে ফেলতেন।

তিনি দুনিয়ার সকল চাহিদা থেকে বিমুখ ছিলেন।

তিনি ইলমের চর্চা করতেন আল্লাহর জন্য। মান-সম্মান বা প্রতিপত্তি অর্জন করার জন্য নয়।

তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ।

তিনি জন্ম থেকে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে সংযমের সাথে জীবন কাটিয়েছেন।

এটা হলো তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। তাকে চেনার সবচেয়ে বড় উপায়। তার ছিলো অতুলনীয় ধৈর্য ও সহনক্ষমতা।

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করতেন। রাত কাটাতেন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে।

যেখানে শান্তির সাথে দুদণ্ড বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ ছিলো না।

অথচ তিনি জাতীয় নেতা। বহু মানুষের আদর্শ পুরুষ।

সকালে তিনি কোনো গ্রামে বা কোন মফস্বল শহরে যেতেন।

সেখানে তিনি বক্তৃতা করতেন। নেতা-কর্মীদের সাথে মিটিং করতেন। আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। তাদের সমস্যার সমাধান বাতলে দিতেন। এভাবে রাত নেমে আসতো।

তিনি আবার উঠে বসতেন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির কোনো কক্ষে। এভাবে তাঁর দিনের পর দিন কাটতো।

দিন গড়িয়ে রাত নামতো। দীনের স্বার্থে তিনি সব কষ্ট মাথা পেতে বরণ করে নিতেন।

এমন কষ্টসাধ্য কাজ মানুষ কিছু উপার্জনের জন্য দু' একদিন করতে পারবে। কিন্তু এই কাজটাই দিনের পর দিন কোনো বিনিময় ছাড়া করে যাওয়ার কথা এই মানুষটিই ভাবতে পারতেন, তা তিনি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে অনুগ্রহের চাদরে আচ্ছাদিত করে রাখুন। আমীন

-সমাপ্ত-

কানো দরজায়
বার নক করুন
মিললে ভেতরে যান
বা ফিরে আসুন

য় শুধু তওবার দরজায়
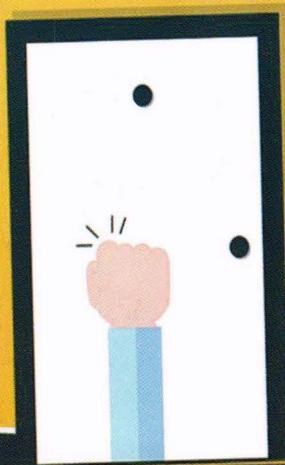
এ দরজায়
বারবার নক করতে থাকুন
অবিরাম ক্ষমা চেয়ে যান
শেষপর্যন্ত দরজা খুলবেই

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত,

মহানবী সা. বলেন,

আল্লাহ তার চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কাছ থেকে হাদিস শুনে অন্যের কাছে হুবহু পৌঁছায়। যাদের কাছে পৌঁছানো হবে, হয়তো তারাই এগুলো বেশি করে মনে রাখবে।

(তিরমিযী : ২৬৫৭)

নন্দিত আরবী কথাসাহিত্যিক
ড. আলী তানতাবীর অনবদ্য রচনা

'মান হুওয়াল মুসলিম' এর বাঙলা অনুবাদ

ধর্ম হিসেবে ইসলাম তিনটি বিষয়ের সমষ্টি–

১. ধর্মের বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন

২. সেগুলোকে অন্তরের গভীর থেকে বিশ্বাসকরণ

৩. এবং সেগুলো কর্মে বাস্তবায়ন।

একজন মানুষ প্রকৃত মুসলিম তখনই হতে পারবে, যখন সে জানবে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সা.-কে দুনিয়ায় নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন এমন এক সময়, যখন নবীদের দাওয়াত না থাকার কারণে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল জাহিলিয়্যাতের ঘোর অন্ধকার। তিনি নবী সা.-কে দিয়েছেন সর্বজনীন ও সর্বকালীন শরীয়ত ও জীবনব্যবস্থা। যে শরীয়ত তার অনুসারীদেরকে দান করেছে দুনিয়া-আখেরাতের সুখময় জীবন। যে জীবনব্যবস্থাকে আল্লাহ তাআলা প্রণয়ন করেছেন বিশ্ববাসীর সুখ, শান্তি ও কল্যাণের জন্য। যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে দেখিয়েছেন সরল ও সুন্দর পথ।

হুদহুদ প্রকাশন সবসময়ই পাঠকের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে বই প্রকাশে মনোযোগী। সেই ধারাবাহিকতায় পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।